#মি-টু বাংলাদেশ ২০১৮
এবং ফিরে দেখা জাহাঙ্গীরনগরের ধর্ষণবিরোধী আন্দোলন ১৯৯৮

সায়েমা খাতুন

নিউইয়র্কের হারলেমের বাসিন্দা তারানা বুর্কি ২০০৬ সালে সুবিধাবঞ্চিত কৃষ্ণাঙ্গ ও বহুবর্ণ নারীদের ওপর যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে যে ক্যাম্পেইন গড়ে তুলেছিলেন সেটাই সৃষ্টি করেছে এই এক যুগের মি-টু আন্দোলন। তারানা ঘোষণা করেছিলেন, 'আমি লজ্জিত নই, আর আমি একাও নই।' যৌন নিপীড়নের ভুক্তভোগী নারীরা পরস্পরের সাথে সংহতিমূলক স্থান করে নেয় : 'আমি তোমাকে দেখছি, আমি শুনছি, এবং আমি বুঝি তোমার কথা, আমি আছি তোমার জন্য।' ২০১৭ সালে হলিউড অভিনেত্রী অ্যালিসা মিলানোর একটি টুইট থেকে সূত্রপাত হয় বৈশ্বিক হ্যাশট্যাগ মি-টু : 'যদি তুমি কখনো যৌন হয়রানির শিকার হয়ে থাকো, তবে এই টুইটের প্রত্যুত্তরে #MeToo লেখো'। সারা বিশ্বের অসংখ্য নারী এতে সাড়া দিলে এটি এক বৈশ্বিক আন্দোলনে রূপ নেয়। 'তোমারই কেন এসব হয়? অমুকের হয় না কেন?'— এ ধরনের মন্তব্যের জবাবে আসছে, আমিও এর একজন। বাংলাদেশে মি-টু শুরু হয় গত বছর ২০১৮ সালে ফেসবুকে প্রকাশিত প্রবাসী ও দেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী নারীদের নিপীড়নের বয়ান প্রকাশের মাধ্যমে।

মি-টু বাংলাদেশ আন্দোলন 'পশ্চিমা', 'হলিউডি', 'বলিউডি', 'পশ্চিমা অনুকরণ' বলে কিছু আওয়াজ দেখলাম। কিন্তু বৈশ্বিক মি-টু আন্দোলন শত বছরের নীরবতা ভঙ্গ করে যা করছে, সেই আলোড়ন কুড়ি বছর আগে সৃষ্টি হয়েছিল ঢাকা শহরের অদূরে বিশ্বের এক অপরিচিত বিশ্ববিদ্যালয়ে, খুবই স্থানিকভাবে। দিনটা ছিল ২০ আগস্ট ১৯৯৮ সাল। ওইদিন ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে আকস্মিকভাবে এবং কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছাড়াই। এই স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল এর এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। পূর্ব-পশ্চিম কোথাও থেকে আমদানি হয় নি, কারো কোনো সাহায্য কিংবা উস্কানির কোনো অবকাশ মেলে নি। ছাত্রীরা ক্যাম্পাসে ধর্ষণের খবর নিশ্চিত হলে কারো কোনো পরামর্শ, নেতৃত্ব, সংগঠনের পরিকল্পনা ছাড়াই স্ফুলিঙ্গের মতো বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এক সন্ধ্যায় এক ছাত্রী হলের মেয়েরা পাশের ছাত্রী হলে মার্চ করে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে বেরিয়ে যায়। এর পর আর তাদের ফিরবার কোনো পথ ছিল না। ছাত্রীদের এক অবিস্মরণীয় মহাবিক্ষোভ বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে রাখে ৪০ দিনের মতো। ধর্ষণকারীদের সনাক্ত, বিচার ও বহিষ্কার না করে তারা ঘরে ফেরে নি। কোনো নারী সংগঠন কিংবা রাজনৈতিক দলের সাহায্য নিয়ে তারা চিন্তিত ছিল না। এ ছিল সত্যিকারভাবে এক 'তল থেকে উঠে আসা' আন্দোলন, নারীদের আন্দোলন।

#MeToo বিশ্বব্যাপী অনেক জান-অজানা জাহাঙ্গীরনগরকে এক সুতোয় গেঁথে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, আমরা কখনো তা কল্পনাও করতে পারি নি। অনেকে বলে থাকেন, এসব প্রকাশ করে কি লাভ? এত বছর আগে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনাকে কি প্রমাণ করা যাবে? কোনো বিচার পাওয়া যাবে? এতে তো নিজেরই সম্মান নষ্ট! বাংলাদেশের মি-টু বয়ানকারী নারীদের সাংবাদিকেরা এমন প্রশ্ন করেছেন। এই প্রশ্ন শুনে আমি কুড়ি বছর আগের আন্দোলনের দিনগুলোতে ফিরে যাই, যখন কোনো ধর্ষিত ছাত্রীর

আত্মপ্রকাশ সম্ভব ছিল না। আমরা আন্দোলনের কর্মী-সংগঠকেরা জানতাম না, কীভাবে ধর্ষণ প্রমাণ করা যাবে, অভিযুক্তকে ছাড়া কীভাবে কোনো অপরাধ আইনিভাবে মোকাবেলা করা যাবে, কীভাবে দেশের কোন আইনে এর বিচার হবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্সের কোন ধারা বলে এর প্রক্রিয়া চলবে? যৌন হয়রানি নিরোধ আইন তো দূরের কথা 'যৌন হয়রানি' বলে কোনো ধারণাই তখন প্রচলিত ছিল না। আমরা আতিপাতি করে অধ্যাদেশ পড়েছি, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের সাথে পরামর্শ করেছি, নারীবান্ধব আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ করেছি। আমাদের সামনে কোনো উদাহরণ ছিল না, কোনো পথ ছিল না; পথ তৈরি করে নিতে হয়েছে। আমরা জানতাম না, কী করে সম্ভব হবে। কিন্তু আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, আমরা পথ আবিষ্কার করে নেব।

১৯৯৮ সালে আমি ছিলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শেষপর্বের ছাত্রী। ১৯৯৯ সালে আমি নৃবিজ্ঞানে অধ্যাপনা শুরু করি। এত বছর আগের একটা সময় নিয়ে লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, অনেক ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ ভুলে গেছি। অনেকের চেহারা আবছা হয়ে গেছে। অনেকের নাম ভুলে গেছি। এই আন্দোলন নিয়ে ঐতিহাসিক পুনর্নির্মাণ এবং পূর্ণ গবেষণার অবকাশ রয়েছে। আন্দোলনকালে 'অশুচি' নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে, যেখান থেকে আমরা তখনকার সময়ে আন্দোলন বিষয়ে প্রকাশিত সকল পত্রিকার ক্লিপিং-এর একটি সংকলন প্রকাশ করেছিলাম। আন্দোলনের আগে ৮ মার্চ পর্ষদ নামে একটি সংগঠন থেকে সাড়ম্বরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস এবং রোকেয়া দিবস উদযাপন এবং নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে অনুষ্ঠান, আলোচনা ও প্রদর্শনীর আয়োজন করতাম আমরা। ৮ মার্চ পর্ষদের কিছু দলিল হয়ত এখন থেকে যেতে পারে। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে পরবর্তীকালে আর কখনো আমার কিছু লেখা হয়ে ওঠে নি। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে একটা স্থান-কালের দূরত্ব থেকে আমি সমগ্র আন্দোলনকে দেখবার একটা সুযোগ পেয়েছি, যা দীর্ঘ এই অভিজ্ঞতার ভেতরে আমাকে এক বৃহৎচিত্র দেখার চোখ দিয়েছে।

১৯৯৮-এর ২০ আগস্টে মেয়েদের প্রথম মিছিলটি বের হওয়ার আগের দিনও কল্পনা করা যায় নি ছাত্রী হলের ভেতরে ফুঁসে ওঠা বিক্ষোভ কোনো বড় আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। কেন্দ্রীয় কোনো পরিকল্পনা কিংবা পাকাপোক্ত নেতৃত্ব ছাড়াই নন-পার্টিজান ছাত্রীদের সমাবেশে একটা দেশ কাঁপানো আন্দোলন নাড়া দিয়ে গিয়েছিল বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রকে। জাহাঙ্গীরনগরের প্রথম ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনকে আমি একটি অপ্রথাগত, সাংগঠনিক কাঠামোবিহীন, স্বতঃস্ফূর্ত অভিনব আন্দোলন হিসেবে দেখেছি। ১৯৯৮ সালের পর আবার ১৯৯৯ সালের ২ আগস্ট খুনি-ধর্ষকবিরোধী আরেকটি বড়ো আন্দোলন সংঘটিত হয়, যেখানে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলো এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা সংগঠিতভাবে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তুলে ক্যাম্পাসে সশস্ত্র ক্যাডারদের দখল প্রতিহত করে দেয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকের বিরুদ্ধে কখনো ছাত্রীর, কখনো নারী সহকর্মীর অভিযোগের ভিত্তিতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্নভাবে আরও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চলেছিল। ২০০৯ সালে যৌন হয়রানি নিরোধে হাইকোর্টের যুগান্তকারী বিধিমালার প্রবর্তন হওয়ার ফলে সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়নবিরোধী সেল গঠনের বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। তাতে অভিযোগ দাখিল করবার প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় আন্দোলন থেমে যায়।

গত কুড়ি বছর ধরে এই আন্দোলনকে ঘিরে উত্তপ্ত, উন্মাতাল যে আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, তা মিলেনিয়ালের বাংলাদেশে নারী-পুরুষের সম্পর্কের চেহারা বদলে দিয়েছে। বিশেষ করে, একদিকে যৌন

নিপীড়ন দেশের আইনি কাঠামোতে অপরাধরূপে অন্তর্ভুক্ত ও স্বীকৃত হওয়ায় এই বিশেষ ধরনের সহিংসতায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার পথ সৃষ্টি হয়; অপরদিকে যৌন নিপীড়নবিরোধী চেতনা ধীরে ধীরে সমাজে শক্ত হয়ে দানা বাঁধতে থাকে এবং অচিন্ত্যনীয়ভাবে প্রতিবাদ জোরদার হতে থাকে। জাহাঙ্গীরনগরে যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলনের সময় সাক্ষ্যপ্রমাণ বা সুস্পষ্ট অভিযোগের অভাবে যা ধরা যায় নি, মি-টু বাংলাদেশ আন্দোলনে সেই অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে আমরা সুস্পষ্টভাবে অভিযোগ জানতে পেরেছিলাম, কিন্তু সেদিন ভুক্তভোগীর প্রকাশ্যে আসবার দ্বিধায় কিছু করা সম্ভব হয় নি। জাহাঙ্গীরনগর বাংলাদেশের নারীদের যে সাহস ও আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে, যে পথ দেখিয়েছে, কুড়ি বছরে তার থেকে অনেক বেশি সাহস সঞ্চয় করে সৃষ্টি হয়েছে মি-টু বাংলাদেশ। ১৯৯৮ সালে আমরা ধর্ষণের শিকার কোনো মেয়ের পরিচয় প্রকাশ করতে পারি নি। বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট যখন ধর্ষিতা কে তা জানতে চেয়েছিল ও না হলে ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের বিচার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল এবং ধর্ষণ ঘটেই নি বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, তখন প্রশাসনিক ভবন অবরোধকারী ছাত্রীরা সমবেতভাবে বলেছিল, 'আমরা সবাই ধর্ষিতা'। কারণ ধর্ষণের শিকার কারো পরিচয় প্রকাশ হওয়ার অর্থ ছিল তার সামাজিক মৃত্যু। তার পরিবারের সমাজে বেঁচে থাকার গ্লানি মৃত্যুর অধিক। মি-টু সেই কলঙ্কের কালিমাকে উড়িয়ে দিয়ে যৌন উৎপীড়কের পরিচয় উদ্ঘাটন করতে শুরু করেছে, তা সে যতই ধনবান, ক্ষমতাবান বা প্রভাবশালী হোক না কেন। এই দুঃসাহস, এই আত্মবিশ্বাস দীর্ঘদিনের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিরোধের ফসল। এক সামাজিক বিপ্লব।

১৯৯৮-এর আন্দোলন শুরু হওয়ার আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আরও কিছু আন্দোলন করে, যা এই ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের পটভূমি রচনা করে। এক. জাহাঙ্গীরনগরের বাসে মেয়েদের গায়ে হাত দেওয়ার প্রতিবাদে আন্দোলন, দুই. ছাত্রী হলে সূর্যাস্ত আইন বাতিলের আন্দোলন, তিন. ছাত্রদল নেতা সীমান্তের ছাত্রী অপহরণের প্রতিবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হলে সূর্যাস্ত আইন বাতিলের আন্দোলন শুরু হলে জাহাঙ্গীরনগরও একই পথ অনুসরণ করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই আন্দোলনের নেত্রী-কর্মীরা আমাদের সাথে সংহতি প্রকাশ করতে এসেছিলেন। ১৯৯৮-এর আন্দোলনের তিন বছর আগে ১৯৯৫ সালের ২৪ আগস্ট পুলিশ বাহিনীর সদস্য কর্তৃক দিনাজপুরে গার্মেন্টস কর্মী কিশোরী ইয়াসমিন আখতারের নৃশংস ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে দেশজুড়ে উত্তাল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। নারী সংগঠনগুলো তখন থেকে ২৪ আগস্ট নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালন করে আসছে। এই ঘটনাটিতে নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনের পরে জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত জনপ্রিয় বিএনপি সরকার এবং দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি জনগণের বিশ্বাসভঙ্গ হয়। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সরকার গঠন করেন। মাঝখানে ১/১১-এ সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে ২০০৭-২০০৮ সালের সামরিকজান্তা নিয়ন্ত্রিত এক অসাংবিধানিক সরকারের শাসন বাদ দিলে সেই থেকে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শক্তি নারী-নেতৃত্বাধীন, সেটা হোক সরকারে অথবা বিরোধী দলে। বাংলাদেশের রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক নেতৃত্ব নারীর হাতে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেখানে এখনো কোনো নারীর পক্ষে সরকারপ্রধান হওয়া সম্ভব হয় নি, সেখানে বাংলাদেশ ২৮ বছর ধরে নারীর নেতৃত্বে প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতার পালা বদলে অংশ নিচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসের দুঃখজনক শিক্ষা হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারীর উত্থান আর সাধারণভাবে সমাজের নারীদের মর্যাদার উন্নতি সমার্থক নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নারী, সরকারপ্রধান, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, সচিব,

রাষ্ট্রদূত কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য— এসব প্রাতিষ্ঠানিক পদ লাভ আপনা-আপনি সমাজে ও পরিবারে নারীর মর্যাদার পরিবর্তন করে না। উলটোভাবে এসব পদ অনেক সময় পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধের পাহারাদারির পুরস্কারস্বরূপ দেওয়া হয়েছে। একে তুলনা করা যায় নারীর দক্ষ নিষ্পেষণে নারী লাঠিয়াল নিয়োগের সাথে। নারীকে সম্মান, মর্যাদা, স্বাধীনতা, সম্পদের ওপর অধিকারের জন্যে প্রতিদিনকার জীবনে রাষ্ট্রের, সমাজের বৈষম্যমূলক নীতিমালা, রীতি-রেওয়াজের সাথে মোকাবেলা করেই পথ চলতে হয়েছে। নারী সংগঠনগুলো সরকারের এসব পুরুষ আধিপত্যবাদী ভাবধারার মোকাবেলা করে গেছে। তাই, নারীর প্রতি সহিংসতার বোঝাবুঝি আওয়ামী লীগ বা বিএনপির পাল্লাপাল্লির বাইরের ব্যাপার। আমার সেই বোঝাবুঝি শুরু হয় নারীবাদী রাজনৈতিক চিন্তার সাথে পরিচয়ের মাধ্যমে।

প্রথম কীভাবে আমি নারীবাদী চিন্তার সাথে পরিচিত হয়েছিলাম, সেটা এখন চিন্তা করলে, প্রথম স্মৃতি আব্বার সংগ্রহের কাজী নজরুল সমগ্র থেকে পড়া 'নারী' কবিতা, স্কুলে পড়বার সময় বেগম রোকেয়ার জীবনী পড়া, কলেজে ভার্জিনিয়া উলফের 'এ রুম অব ওয়ানস অউন' পড়া। তবে এঁরা কেউই যৌন নিপীড়নের বিষয়ে কিছু বলেন নি। যৌন নিপীড়ন নিয়ে বাংলাদেশ ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চুপ; যেন এমন কোনো কিছুর অস্তিত্বই নেই; যেন এমন কিছু কখনো ঘটে না। এই অস্বীকৃতি, ভান, মিথ্যাচারিতা, এই হিপোক্রেসির প্রাচীর ভাঙার সাহস, বুদ্ধি বা উপায় কেউ খুঁজে পাচ্ছিল না। ভাষার অভাবে গুমরে মরছিলাম আমরা বাংলাদেশের নারীরা।

হাইস্কুলের ছাত্রী থাকাকালে এক সন্ধ্যায় উত্তরায় আমার মায়ের সাথে হেঁটে বাড়ি ফিরবার সময় এক অচেনা সাইকেল আরোহী খালি রাস্তা রেখে আমার দিকে সাইকেল চালিয়ে আমার গায়ের ওপর পড়ে। আমি অবাক ও অপদস্থ। লোকটাকে কিছুই বলা গেল না। বাড়ি ফেরার পর আমার বাবা বলেন, অনেক জিনিস আছে যা বলা যাবে না। কিন্তু, আমার ওপর অজস্র বিধিনিষেধ আরোপ করা হলো। এই 'না বলা'কে বলা এক ভয়ঙ্কর নীরবতা ভঙ্গ করা। অকথ্য যন্ত্রণাকে কথ্য করে তোলা, ভাষার কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা, আলাপচারিতা করতে পারা ছাড়া একে ধরবার উপায় কী? সামাজিক রাজনৈতিক পরিসরে এই আলাপই অগ্রহণযোগ্য ও অবৈধ। এই আলাপচারিতার জন্যে আছে সামাজিক শাস্তি; যেমন, কলঙ্ক, লজ্জা, সমাজচ্যুতি।

এই স্থিতাবস্থা ভাঙা শুরু হয় নব্বইয়ের দশকে। মেয়েরা ব্যাপকভাবে শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়, দেশজুড়ে গড়ে ওঠে গার্মেন্টস কারখানা। পাবলিক পরিসরে, রাস্তায়, বাসে প্রতিদিন নারীরা চলাচলের সময় চেনা-অচেনা পুরুষের অনাকাঙ্ক্ষিত যৌন আক্রমণের শিকার হতে থাকে। শিক্ষা ও লেখালেখির জগতে বিচরণ শুরু করে নারী এই অব্যক্তকে ব্যক্ত করবার হাতিয়ার খুঁজে নেয়। সবচেয়ে বড়ো কথা হলো, একা একা নীরবে যন্ত্রণা ভোগ না করে মেয়েরা এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করে। রাজনৈতিকভাবে ও আইনিভাবে মোকাবেলার জন্যে পাবলিক পরিসরে আলাপচারিতার মাধ্যমে কন্সেনসাস গড়ে তুলতে একটি দুর্জ্ঞেয় শক্তি হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। নারী-পুরুষ সম্মিলিত সংহতিতে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলার এক শক্তিশালী যৌথচেতনা গড়ে তোলে।

যৌন নিপীড়ন করা যাবে, বলা যাবে না : অচলায়তনে আঘাত এবং নীরবতা ভাঙা

যৌন নিপীড়ন নিয়ে বাংলাদেশে প্রথম আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন তসলিমা নাসরিন। সেটা ১৯৮৯ সাল। তার কিছু আগে প্রকাশিত নীলিমা ইব্রাহিমের দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'আমি বীরাঙ্গনা বলছি'র বয়ানগুলোকে

যুদ্ধকালীন পাক হানাদারবাহিনীর নৃশংসতা বলে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু সম্পূর্ণ শান্তিকালীন স্বাভাবিক দিনের রাস্তায় চলাচল করবার সময়, পহেলা বৈশাখ উদযাপনের সময়, বাংলা একাডেমির বইমেলার মতো, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মতো আলোকিত স্থানে সম্পূর্ণ স্বদেশি, চেনা-অচেনা, সহপাঠী, সহকর্মীদের দ্বারা যে যৌন নিপীড়ন ঘটতে পারে, অহরহ ঘটে থাকে, সেই নিয়ে সমাজ ছিল সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। এই নিশ্চুপতায় লক্ষ্যভেদী আঘাত করেছিলেন তসলিমা নাসরিন। এই আঘাত আর কিছুই নয়— কোনো মিছিল নয়, সমাবেশ নয়, বক্তৃতা নয়, রাজনৈতিক আন্দোলন নয় কিংবা নয় কোনো সংগঠিত পরিকল্পিত হামলা। এক দৈনিক পত্রিকায় একা একজন নারীর লেখা সাদামাটা এক এলেবেলে কলাম মাত্র। ১৯৮৯ সালে তৎকালীন দৈনিক 'ভোরের কাগজ'-এ 'নির্বাচিত কলাম' শিরোনামে লিখতে গিয়ে তসলিমা কিশোরী বয়সে রাস্তায় চলতে গিয়ে এক পথচারীর দ্বারা অকস্মাৎ যৌন নিপীড়নের সত্য ঘটনা বর্ণনা করেন। এই বর্ণনাটি সম্ভবত বাংলাদেশে প্রথম প্রকাশিত বয়ান। ১৯৯২-এর বইমেলায় 'নির্বাচিত কলাম' বই আকারে প্রকাশ পাওয়ার পর থেকে এটি বাংলাদেশের নারীবাদী চেতনার বিকাশে একটি মাইলফলক হয়ে আছে। ধর্মগ্রন্থের বাইরে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের মধ্যে এটি একটি। এর সবচাইতে ব্যতিক্রমী সারবস্তু ছিল, বাংলাদেশের নারীদের প্রাত্যহিক জীবনে যৌন নিপীড়নের অকথ্য যন্ত্রণা ও অপমানকে আলোচনার টেবিলে আনতে পারবার এক ভয়ঙ্কর সাহস। তসলিমাকে এই দুঃসাহসের কঠিন পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে।

বাংলাদেশে এর আগে নারীদের ইস্যুগুলো ছিল মূলত ঊনবিংশ শতকের নারী জাগরণ আন্দোলন, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসঞ্জাত; শিক্ষা, সমানাধিকার, বিয়ে, যৌতুক, তালাক, ভরণপোষণ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের মতো বিষয়গুলোকে ঘিরে। উদারনৈতিক ভাবধারা ও উন্নয়নের মডেলে এই ইস্যুগুলোর সাথে আধুনিক বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র উদারনৈতিক সম্মতি দিয়ে আসছিল। এতে পুরুষতন্ত্রের সাথে বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয় নি; কিন্তু যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে নারীদের সংঘবদ্ধভাবে মাথা তুলে দাঁড়ানো একটা র‍্যাডিকাল অবস্থান সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে নারী আন্দোলন তখন থেকে নারীবাদী আন্দোলনে রূপ লাভ করে। আগের আন্দোলনও অ্যাকাডেমিক ভাষায় নারীবাদ। কিন্তু 'নারীবাদ' কথাটার যে কলিজা কাঁপানো ধাক্কা, যে ভয়মিশ্রিত ঘৃণা, সেটা যৌনতার রাজনীতির খোল-নলচে বদলে দেওয়ার আগে ছিল না। অনেক নারী— আমি সন্তান ও পরিবারের কল্যাণে কাজ করি, আমি মাতা-কন্যা-স্ত্রী, আমি ওইসব ঘরসংসার জ্বালানি 'নারীবাদী-ফারিবাদি' না— এই ভয়-ঘৃণার জায়গা থেকেই বলে থাকেন। বাংলাদেশে 'নারীবাদী' বলে ঘৃণা-বিদ্বেষ, গালি, কলঙ্ক, ব্র্যান্ডিং ও কোণঠাসা করার সূত্রপাত সেখান থেকেই। কিন্তু পরিহাস হলো, যৌনতার ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করলেই যৌন আক্রমণ থেকে বাঁচা যায় না এবং দুর্ভাগ্যজনক হলো, নীরব ভালো মেয়েদের বাঁচাবার কেউ নেই।

ষাটের, সত্তরের, আশির দশকের কুসুম কুসুম নারী অধিকার আন্দোলনে যে উদার পুরুষেরা পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই আন্দোলন 'নারীবাদী' চরিত্র ধারণ করবার সাথে সাথে যেন অ্যাসিড টেস্টে সব ঝরে গেল, নারীবাদের ঝড়ে ঝরে গেলেন উদার পুরুষেরা। এ যেন পুরুষের আধিপত্যের বৈধতা নিয়ে একটা সম্মুখযুদ্ধের আহ্বান। এর আগের বিষয়গুলোর সাথে নারীর যৌনশুচিতা লজ্জিত হয় নি, বরং ছিল অনেকখানি ঔপনিবেশিক সভ্যকরণ প্রক্রিয়ার লিগ্যাসি বহন করে যাওয়া। শিক্ষিত হওয়া, মার্জিত ও

রুচিশীল হওয়া, সভ্য হওয়া ইত্যাদির বিষয় ছিল— 'কোন জাতি কত সভ্য তা বোঝা যায় তাদের সমাজে নারীদের অবস্থা থেকে'— এই সব উদার আপ্ত বাক্য পড়ে আমরা শিক্ষিত হচ্ছিলাম।

'যৌন পীড়ন' ধারণাটির ব্যবহার মাত্রই 'সতীত্ব', 'শুচিতা'র ওপর কুঠারাঘাত পড়ে, যেটা পিতৃতন্ত্রের ভিটেমাটি। পীড়ন হলো কি না হলো, সেটা পিতৃতন্ত্রের মাথাব্যথা নয়; তার মূল দুশ্চিন্তা হলো, অক্ষত যৌন শুচিতা। সেটা আবার কেবলই নারীর জন্যে। যৌন পীড়ন প্রকাশ্যে আনতে হলে বিক্ষত 'শুচিতা' প্রকাশ্যে আসে। নারীবাদী চিন্তার মোড় ঘুরানো অবস্থানটি হলো, নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে গণ্য না করে বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন পূর্ণ বিকশিত মানবসত্তা বলে স্বীকার করা, তার আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা স্বীকার করা। সম্মতিবিহীন, জোর বা কৌশলপূর্বক নারীকে যৌন সম্পর্কে বাধ্য না করা। যৌন সম্পর্ক নারীর সম্মতির ভিত্তিতে একটি স্বাধীন, মর্যাদাকর, আনন্দায়ক সম্পর্ক হতে হবে। নারীর সম্মতি-অসম্মতি এখানে মূল প্রশ্ন হবে। এটি পুরুষতন্ত্রে কুঠারাঘাতের সামিল। এই কুঠারাঘাত বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে র‍্যাডিকাল নারীবাদী অবস্থান।

নতুন পরিভাষা সৃষ্টির সাহস এবং নারীবাদী যৌথ চেতনার উত্থান

পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে সমঝোতা করে শান্তিপূর্ণভাবে ভদ্র-শোভন সভ্য-ভব্য ভাষায় যৌন নিপীড়ন নিয়ে কথা বলা যায় না। বিষয়টি খোদ ভয়ঙ্কর কদাকার, সহিংস ও অপরাধমূলক। ধর্ষণ ও যৌন পীড়নের বিষয়ে কথা বলাই পুরুষতন্ত্রের গোড়ায় আঘাত করা, ক্ষমতা কাঠামোর উৎপাটন, সোজা বাংলায় নারীবাদী বিপ্লব। বাংলা ও হিন্দি সিনেমায় যৌন হয়রানি ও ধর্ষণ যত সুলভ, বাস্তবে আইনি পরিভাষায় তা ঘটার প্রমাণ করা ততই দুর্লভ। নারীকে 'চরিত্রহীন' প্রমাণ করা যত সহজ, পুরুষকে যৌন নিপীড়ক প্রমাণ করা ততই কঠিন। বরং নারীর জন্যে বুমেরাং হয়ে তার বিরুদ্ধেই ব্যবহৃত হয়। অন্তত ১৯৯৮ সালে অবস্থাটা ছিল এরকমই। তখনো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে দুই-আড়াই লাখ নারীর ধর্ষণের ইতিহাস ধামাচাপা পড়ে ছিল। তখনো একাত্তরের নিপীড়িত নারীরা নৈঃশব্দ্যের অন্ধকার গহ্বরে ২৭ বছর ধরে তিলে তিলে জীবন্মৃত হয়ে আছে। দেশে ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের ঘটনা ছিল সর্বত্র। অথচ তার কোথাও কোনো প্রতিকার ছিল না। ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়ন ঘটলে ভিকটিমের 'দোষ' হিসেবে সাব্যস্ত করা হতো। কাজেই নিপীড়িতকে লুকিয়ে ফেলতে হতো সেসব ঘটনা। আমার মনে পড়ে, আন্দোলনের শুরুতে আমাদের নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলের ফটকে কে বা কারা রাতের অন্ধকারে পোস্টার মেরে যায় 'ধর্ষণ ঘটে মেয়েদের দোষে'। সুতরাং আমাদের শুরু করতে হয়েছে সেখান থেকে।

জাহাঙ্গীরনগরে বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের নতুন ইতিহাস রচিত হয়েছিল। ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন তো দূরের কথা, কোনো মেয়ের পক্ষে এরকম কিছু ঘটেছে বলে কারো কাছে প্রকাশ করাও ছিল এক ভয়ঙ্কর দুঃসাহসের কাজ। 'যৌন হয়রানি', 'যৌন নিপীড়ন' এই শব্দবন্ধগুলো ছিল সম্পূর্ণ অজানা। 'যৌন' শব্দটাতেই লোকে যেন একটা অস্বস্তি বোধ করত। ঘটনার বর্ণনায় অনেকে 'শ্লীলতাহানি', 'নির্যাতন', 'পাশবিক', 'অমানুষিক' ইত্যাদি শব্দে ইনিয়ে বিনিয়ে পাশ কাটিয়ে সভ্য-ভব্য করবার চেষ্টায় কসরত করতেন। রেহনুমা আহমেদ ও মানস চৌধুরী তখনকার দৈনিকে লিখেছিলেন, 'যৌন হয়রানিকে তবে কি বলব? গোলাপ ফুল?' হাইকোর্টের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা ও নির্দেশনা তৈরির পরেও পাবলিক পরিসরে যৌন অপরাধকে মোলায়েম করে ঠাট্টা-মস্করার উপযোগী 'ইভ-টিজিং'-এর মতো শব্দে এখনো মিডিয়া চালানোর চেষ্টা করছে। ১৯৯৯ সালে রেহনুমা আহমেদ ও

নাসিম আখতার হোসেইন বাংলাদেশে প্রথম যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা প্রস্তাব করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। এর পর ১৭ জন শিক্ষকের স্বাক্ষরসমেত এই নীতিমালা প্রতি বছর ৮ মার্চে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হতে থাকে। এমনকি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এই প্রস্তাব অনুমোদন করে পেশ করলেও কখনো তা গৃহীত হয় নি। এই শিক্ষকদের দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায়, আরও আইনজ্ঞদের যুক্ততায় এবং সব শেষে, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির রিটের ফলে ২০০৯ সালে হাইকোর্টের রায়ে বাংলাদেশে যুগান্তকারী যৌন হয়রানি নিরোধ বিধিমালার প্রবর্তন হয়।

পত্র-পত্রিকায় ধর্ষণ ও যৌন নিপীড়নের খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে সে সময় যৌনবাদী ভাষা এবং রগরগে পরিবেশনার ফলে সারভাইভার নারীর জীবনযাপনে দ্বিতীয় দফার সহিংসতা ঘটা নিয়ে সচেতনতা গড়ে ওঠে। যার ফলে পরবর্তীকালে পত্রিকায় এসব খবর প্রকাশে অনেক পেশাদারিত্ব ও দায়িত্বশীলতা দেখা যাচ্ছে। নারী সাংবাদিকেরা এ ক্ষেত্রে একটা বড়ো ভূমিকা পালন করেন। এসব পরিভাষা নিয়ে ছাত্রী অবস্থায় আমরা জাহাঙ্গীরনগরের নারীবাদী শিক্ষক-সহপাঠী-বন্ধুদের সাথে দিনের পর দিন পড়াশোনা করেছি। নারীবাদী তাত্ত্বিক চিন্তা এবং আন্দোলনের ইতিহাস তন্নতন্ন করে পড়েছি। তখন না ছিল গুগল, না ছিল ইন্টারনেট। সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্রের লাইব্রেরি, নৃবিজ্ঞান বিভাগের লাইব্রেরি, রেহনুমা আহমেদ, আনু মুহাম্মদ, সাঈদ ফেরদৌস, মানস চৌধুরী, নাসিম আখতার হোসেইন, মেঘনা গুহঠাকুরতা, শিপ্রা বোসের ব্যক্তিগত লাইব্রেরির বই ২৫ পয়সার 'খোলাই-বাঁধাই' করে ঝাঁজরা করে ফেলেছি। আমরা নারীবাদী তত্ত্বচিন্তা ও আন্দোলনের ইতিহাসের ভাণ্ডার গড়ে তুলছিলাম। এর মধ্যে রেহনুমা আহমেদের গ্রন্থসংগ্রহ ছিল নারীবাদী তত্ত্বচিন্তার সবচাইতে সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এই প্রথম দেখলাম, কীভাবে জটিল গ্রন্থগত বিদ্যাকে জীবনের আসল সংগ্রামে দেশলাই কাঠির মতো ব্যবহার করা যায়। পুস্তকে সঞ্চিত জ্ঞানের শক্তিকে কীভাবে আলাদীনের দৈত্যের মতো ডেকে আনা যায়। পথনাটক, চলচ্চিত্র, কবিতা, গান, কার্টুন, কলাম, দেয়াল পত্রিকা, পোস্টার, মিছিল, সমাবেশ, মুক্ত-আলোচনা— এসব সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফর্মে আমরা আমাদের বক্তব্যকে জনসাধারণের কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেদিনের এবং তার পরবর্তীকালের শিক্ষার্থীরা অনেকেই গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে নারীবাদী তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিল। আমি নিজে নড়াইলের তেভাগা আন্দোলনের নারীবাদী ইতিহাস রচনায় নিয়োজিত হয়েছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখনে ধর্ষিত নারীদের অদৃশ্যমানতা নিয়ে গবেষণা করেছি। অনেকে পরবর্তীকালে জেন্ডার অধ্যয়নে উচ্চতর কোর্স ও ডিগ্রি নেন। বাংলাদেশে নারীবাদী জ্ঞানকাণ্ডের বিকাশে অনেক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এবং লেখা এভাবেই সৃষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আমাদের নিজেদের তিলে তিলে তৈরি করতে হয়েছিল। সংগঠন পরিচালনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকায় আমাদের শিখে নিতে হয়েছিল কীভাবে প্রেস রিলিজ পাঠাতে হয়, সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয়, জনসমাবেশে বক্তৃতা করতে হয়, সমাবেশ আহ্বান করতে হয়; কীভাবে লেখালেখির মাধ্যমে জনমত গড়ে তুলতে হয়, প্রুফরিডিং করতে হয়, লেখা রিভিউ করতে হয়; কীভাবে পাবলিক ডিবেটে ঢুকে পড়তে হয়, তথ্য-উপাত্ত-যুক্তি-বুদ্ধি প্রয়োগ করে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়, নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হয়; এবং কীভাবে নির্বাচন করতে হয় ও নেতৃত্ব দিতে হয়। এসব ছিল আমাদের রাস্তার সংগ্রাম থেকে শিখে নেওয়া জীবনের শিক্ষা। আমরা নিজেরাই নিজেদের শিখিয়েছি। আর শিখতাম রাস্তায় চলতে চলতে। বাংলাদেশের সমাজ বদলকামী শক্তিগুলোর সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব, সংহতি ও ঐক্য গড়ে ওঠে। নারীপক্ষ, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘসহ বাংলাদেশের নারী সংগঠনগুলো জাতীয় পর্যায়ে সরব থাকে। গণতান্ত্রিক বিপ্লবী জোট, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন, লেখক

শিবির, সমাজ চেতনা, সমগীত, প্রগতির পরিব্রাজক দল, নারী প্রগতি, গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরাম, হিল উইমেনস ফেডারেশন, বাম ছাত্রজোটসহ বিভিন্ন পাঠচক্র, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে মিত্রতা তৈরি হয়। দৃক প্রথম থেকেই আলোকচিত্র ও প্রকাশনার মাধ্যমে এই আন্দোলনে একটি শক্তিশালী পক্ষের ভূমিকা পালন করে। তখন ইন্টারনেটের প্রথম যুগে দৃকের দ্রুততম ও শক্তিশালী সিস্টেমে আমাদের ক্যাম্পেইনকে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। এর কিছুদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরও যৌন নিপীড়নবিরোধী আন্দোলন হলে আমরা সংহতি প্রকাশ করি। শহিদুল আলম, তাসলিমা আখতার, জোনায়েদ সাকী, মোশরেফা মিশু, সমারী চাকমা, উজ্জ্বল বালো, নেসার আহমেদ, শাহনাজ সুমী, তাসলিমা মিজি বহ্নি, ফারজানা রূপা, শাকিল আহমেদ, শামীমা আক্তার, অরূপ রাহী, কফিল আহমেদ, জাহান-এ-গুলশান শাপলা, ইফতেখারের মতো বহু মানুষ তাদের প্রথাবিরোধী চিন্তা, অক্লান্ত পরিশ্রম, লেখালেখি, বক্তৃতা, ছবি, গান, সাহস ও প্রেরণায় যৌন নিপীড়নবিরোধী এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়েছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকের জীবনকে আমূল বদলে দিয়েছিল, জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথাগত গণ্ডির বাইরে গিয়ে, ছকে বাঁধা মধ্যবিত্ত জীবনের মূল্যবোধে আঘাত করে, আমাদের জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, ব্যক্তিগত ও যৌথ বহু দুর্ভোগ বরণ করে আমরা এ জীবন যাপনের যোগ্য করে তুলেছিলাম। আমাদের পারিবারিক, সামাজিক জীবন ও সম্পর্ক, প্রেম ও বিবাহিত জীবন, পেশা আর কখনো আগের মতো থাকে নি। আমরা হয়ে উঠেছিলাম রূপান্তরিত নারী, রূপান্তরিত মানুষ।

কুড়ি বছর পরে এই আন্দোলনের হাজার ছাত্রীর মিছিলের অনেকের নাম আর মনে নেই। জাহাঙ্গীরনগরের ফারজানা শম্পা, সাদাফ-নুর এ ইসলাম, ইভা মীর্জা, সায়দিয়া গুলরুখ, জোবাইদা নাসরিন কনা, আয়েশা আখতার, ফারহানা হাকিম কথা, ফারজানা সিদ্দিকা রনি, জায়েদা শারমিন স্বাতী, নাসরিন সিরাজ অ্যানি, নাজনীন শিফা, অনন্যা শিলা শামসুদ্দিন, অমিতা চক্রবর্তী— এমন আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নারী এই উত্থানের পুরোভাগে ছিলেন। নারীবাদীদের ভয়ে অনেক উদার পুরুষ বাবা-ভাই-বন্ধুসঙ্গ ত্যাগ করলেও জাহাঙ্গীরনগরে ঘটেছিল এক বিস্ময়কর ব্যাপার। একজন দুইজন করে অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক-সংগঠক আমাদের মিছিলে এল। আমার মনে পড়ে প্রথম দিকে তানভীর মুরাদ তপু, নৃবিজ্ঞান বিভাগের এক ছোট ভাই (পাঠশালার বিশিষ্ট আলোকচিত্রি) আমাদের ৮ই মার্চ পর্ষদের মিছিলের একমাত্র ছাত্র কমরেড ছিল। পরে আসে প্রাণিবিজ্ঞানের পাভেল পার্থ। মনে পড়ে বাংলা বিভাগের ফারুক ওয়াসিফ (বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক), বরকত উল্লাহ মারুফ (কবি, লেখক, চিত্রনাট্যকার) ছিল আমাদের সাথে মাটি কামড়ে থাকা শক্তিশালী সহযোদ্ধা।

জাহাঙ্গীরনগরের দ্বিতীয় দফার ধর্ষকবিরোধী আন্দোলন শুরু হয় পরের বছর ২ অগাস্ট ১৯৯৯ সালে, যখন আমরা জাহাঙ্গীরনগর থেকে বেরিয়ে গেছি। এই আন্দোলন খুনী-ধর্ষকবিরোধী এক বিরাট আন্দোলন ছিল, যেখানে সংগঠিত সাধারণ ছাত্ররা এবং বাম সংগঠনগুলো ছাত্রলীগের খুনী-ধর্ষক গ্রুপের দখল থেকে ছাত্রদের হলগুলোকে মুক্ত করে। প্রশাসন ন্যাক্কারজনকভাবে ফারুক ওয়াসিফসহ আন্দোলনকারী একটা বড়োসংখ্যক ছাত্রকে বহিষ্কার করে। জাহাঙ্গীরনগরের ছাত্র হলে ছাত্ররা দুঃসাহসের সাথে ব্যাপকভাবে এই আন্দোলনে প্রবেশ করে, তর্ক-বিতর্ক করে, সংগঠিত করে এবং নেতৃত্ব দেয়। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল, এই আন্দোলনকে বোঝাবুঝির তর্ক-বিতর্কগুলোতে তারা নিজেদের

পুরুষতান্ত্রিক সুবিধা প্রত্যাখ্যান করে সমাজের সামনে পুরুষের নতুন মডেল তৈরি করে। জাহাঙ্গীরনগরের নারীবাদী পুরুষেরা নারীদের সাথে সমমর্যাদার অংশীদারিত্বের নতুন প্র্যাকটিসের সূত্রপাত করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠন হিসেবে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশন, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, নারী প্রগতি— এই সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে এই আন্দোলন বেগবান করেছিল। গোঁড়া থেকেই বাম সংগঠনগুলো এই আন্দোলনের পুরোভাগে থেকেছে; কিন্তু ১৯৯৮-এর প্রথম বিক্ষোভে ছাত্রীরা সাধারণ ছাত্র ঐক্য গঠন করে বাম-অবাম শক্তিকে সংগঠিত করে আন্দোলন পরিচালনা করেছিল।

অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং ব্যাকল্যাশ

১৯৯৮-এ এসে যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি পূর্ণ বিকশিত রাজনৈতিক আন্দোলন বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক সম্পর্ককে আমূল প্রশ্নের সামনে দাঁড় করায়। এই ধর্ষণবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গী-সাথীদের সাথে যেমন একটা গভীর জীবনব্যাপী বন্ধুত্ব ও সংহতি গড়ে উঠেছিল, তেমনি ছিল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব : কেন কেবল নারীর নিপীড়ন নিয়ে কথা বলব? পুরুষও তো নিপীড়িত। নারীদের নিয়ে পৃথক রাজনীতির প্রয়োজন কেন? পুঁজিবাদের উচ্ছেদ হলেই তো সব সমস্যার সমাধান। মানবমুক্তি চাইব, আলাদাভাবে নারী মুক্তি কেন? নারীবাদ আসলে এনজিওদের প্রজেক্ট। এটা মধ্যবিত্তের আন্দোলন।

কেবল ছাত্রী আন্দোলন কেন? সবার আন্দোলন নয় কেন? নেতৃত্ব কার ছিল, সাধারণ ছাত্র ঐক্য, না বাম সংগঠনের? স্বতঃস্ফূর্ত না সংগঠিত?

যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণের সংজ্ঞায়ন, নারীবাদ বনাম মানবতাবাদ, নারীবাদ ও মার্ক্সবাদ, পুঁজিবাদ ও নারীবাদ— ইত্যাদি ইস্যু নিয়ে মানবতাবাদী, উদারপন্থী, ইসলামপন্থী, মার্ক্সবাদী, সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্ট ঘরানার বিভিন্ন মিত্রদের সাথে আমাদের হরদম তর্ক চলত। জটিল ধারণাগত সেই তর্ক-বিতর্কগুলো নিয়ে একসময় আলাদাভাবে লিখতে হবে। সেগুলো আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের ইতিহাস, বাংলাদেশে নারীবাদী চেতনার প্রবাহের ইতিহাস। এই রাজনৈতিক চিন্তার ভেতর বাংলা সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সংগীত, গণমাধ্যমের রূপান্তর না হওয়া পর্যন্ত পুরুষতন্ত্রকে কেবল আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঝেটিয়ে বিদায় করা সম্ভব নয়। আইন আসে অপরাধ সংঘটনের পরে। ভিকটিম-পারপেট্রেটর সম্পর্কের কাঠামো ভাঙা, ভিকটিমের ভূমিকা ছেড়ে কর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া, ধর্ষকামী সমাজ-সংস্কৃতি, সহিংস ভাষার রূপান্তর কেবল মিটিং-মিছিল দিয়ে হবার নয়, যদি না এই বদল অন্তরের ভেতর থেকে আসে। এ এক আত্মরূপান্তরের গভীর প্রক্রিয়া। আত্মের আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধিকরণ।

যৌন নিপীড়ন এক মহাবিষাদ অন্ধকার সমুদ্র। আমরা সেই মহাবিষাদসিন্ধু থেকে আনন্দময় রঙিন জীবনকে আহ্বান করেছি। এই আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ সময়ে যেমন মনে হতো আমরা নারী-পুরুষের সম্পর্ককে আমূল বদলে দিচ্ছি, বাস্তব জীবনে কিন্তু সব সময় সেরকমটা হয় নি। আজও আমরা প্রতিদিনের জীবনে পূর্ণ বিকশিত মানুষের আত্মপ্রকাশের জন্যে মূল্য দিয়ে যাচ্ছি। জাহাঙ্গীরনগরের বাইরে এসে বিচ্ছিন্নভাবে বৃহৎ সমাজ জীবনের মুখোমুখি হয়ে দেখেছি, কেন নারীর লড়াইকে দীর্ঘতম বিপ্লবের পথ বলা হয়েছে।

এক সময়ে জাহাঙ্গীরনগরের অগ্নিগর্ভ চেতনাও থিতিয়ে গেছে এবং আন্দোলনও থেমে গেছে। নিপীড়িত নারীকে কোণঠাসা করা নারীবিদ্বেষী শক্তি ক্ষমতায় আরোহণ করেছে। যৌন নিপীড়ন অভিযোগ সেলে

সর্ষের ভেতর ভূত। নারীবাদী বৈপ্লবিক রাজনৈতিক চেতনা দখল করেছে বেতনভোগী জেন্ডার এক্সপার্টের দল। নারী দিবস দখল করেছে করপোরেট। দেশজুড়ে যৌন নিপীড়নের খবর বিভীষিকাময় চেহারা নিয়েছে। বাংলাদেশের বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক সংকট, গণতন্ত্রের লড়াই, পশ্চিমা বিশ্বায়নের প্রবল শক্তির মোকাবেলায় নারীবাদী শক্তির সামনে রয়েছে দীর্ঘতম পথ, কঠিনতম পরীক্ষা। যেজন্যে প্রয়োজন নিজেদের দীর্ঘমেয়াদি পাল্লার জন্যে প্রস্তুত করা। গোটা বিশ্ব সেই সংহতির জন্যে প্রস্তুত। তাই আমিও প্রস্তুত। মি-টু।

২৪ নভেম্বর ২০১৮ - ২৬ জানুয়ারি ২০১৯। উইসকনসিন, যুক্তরাষ্ট্র

সায়েমা খাতুন সহযোগী অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র। sayema.bd@gmail.com

তথ্যসূত্র

1. http://time.com/5475966/silence-breakers-2018/
2. https://shahidul.wordpress.com/2008/07/07/of-roses-and-sexual-harassment/
3. http://wiki.preventconnect.org/history-of-the-rape-crisis-movement-and-sexual-violence-prevention/
4. https://www-jstor-org.ezproxy.lib.uwm.edu/stable/1395708?seq=2#metadata_info_tab_contents
5. https://thotkata.com/2015/04/17/anti-rape-movement-1998-see-no-evil-speak-no-evil-hear-no-evil/
6. http://www.resourcesharingproject.org/brief-history-anti-rape-movement
7. http://shahidulnews.com/eve-teasing-of-semantic-shifts-and-criminal-cover-ups/
8. https://www.thedailystar.net/perspective/rape-impunity-and-power-then-and-now-1442611
9. https://thotkata.com/2018/12/09/critically-engaging-with-metoo/
10. https://www.ajc.com/news/world/who-tarana-burke-meet-the-woman-who-started-the-too-movement-decade-ago/i8NEiuFHKaIvBh9ucukidK/
11. https://www.chicagotribune.com/lifestyles/ct-me-too-timeline-20171208-htmlstory.html